রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ হিলসিংকি ফিনল্যান্ড থেকে ড. মনজুর আলম

রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা'র গুরুত্ব যে কতখানি এবং কতটা স্পর্শকাতর হতে পারে সেটা গত ১৮ জুন ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আননেলি ইয়াত্তেনম্যাকির মাত্র দুই মাস ক্ষমতায় থাকার পর রাষ্ট্র ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার মাঝে আবার প্রমাণিত হলো।

ফিনল্যান্ড, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের একটি দেশ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য। আয়তন ৩৩৮০০০ বর্গ কিলোমিটার। ইউরোপের সর্ববৃহৎ আর্কিপেলাগো যার মাঝে আধা-স্বায়ত্তশাসিত 'অল্যান্ড' অন্তর্ভুক্ত। জনসংখ্যা ৫২ লক্ষের কিছু বেশী। ৬৭% লোক শহরে এবং ৩৩% গ্রামাঞ্চলে বাস করে। জনসংখ্যার ৮৫.৬% লুথারিয়ান ও ১% অর্থডক্স খ্রিস্টিয়ান ধর্মাবলম্বী। কয়েক হাজার মুসলমানও এ দেশে বাস করে। অধিকাংশ মুসলমানই তাতার বংশোদ্ভূত এবং সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা। কয়েক শত বাংলাদেশীও এ দেশে বিভিন্ন পেশায় জড়িত।

ফিনল্যান্ড ১৯১৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমান গঠনতন্ত্র ১৯১৯ সালে গৃহীত হয় এবং নিজেকে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। ফিনল্যান্ড ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘে এবং ১৯৯৫ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগ দেয়।

ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি। জনসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। শিক্ষিতের হার ১০০%। ১৭৯ ৮৮৮টি লেক ও ১৭৯ ৫৮৪টি দ্বীপ দিয়ে সাজানো এ দেশ। এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা ২টি। ফিনিশ ও সুইডিশ। ৯৪% লোক ফিনিশে এবং ৬% লোক সুইডিশে কথা বলে। তাছাড়া কিছু লোক 'সামি', ও 'রাশান' ভাষায়ও কথা বলে। গ্রীষ্মে গড় তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং শীতে উত্তরে ১৫ ডিগ্রী থেকে ৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। দেশের উত্তর অংশে প্রায় ৭৩ দিন সূর্য অস্ত না যাওয়াতে গ্রীষ্মে উজ্জ্বল দিনের মতো পুরো রাত্রি অতিবাহিত হয়। অপর দিকে, শীতকালে প্রায় ৫১ দিন সূর্য উদয় হয় না বলে দিন রাত্রি ২৪ ঘণ্টাই রাত্রির মতোই মনে হয়। দেশের অর্থনীতি সাধারণত বন সম্পদ, ধাতব শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেলি-যোগাযোগ শিল্পের উপর নির্ভরশীল। বিখ্যাত ফোন কোম্পানী 'Nokia' ফিনল্যান্ডেরই।

এটি একটি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক দেশ। প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থা। ২০০৩ সালের ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন দল নিম্নে বর্ণিত আসন ও ভোট পায়। সেন্ট্রাল পার্টি ৫৫টি আসন ও (২৪.৭%) ভোট, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ৫৩ (২৪.৫%), ন্যাশনাল কোয়ালিশন পার্টি ৪০ (১৮.৬%), লেফট এলায়েন্স ১৯ (৯.৯%), গ্রীন পার্টি ১৪ (৮%), সুইডিশ পিপল্‌স পার্টি ৮ (৪.৬%), ফিনিশ ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়ন ৭ (৫.৩%), ট্রু ফিন দল ৩ (১.৬%), অন্যান্য (অল্যান্ড প্রতিনিধি) ১ (২.৮%)। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সেন্ট্রাল পার্টি প্রধানমন্ত্রী আন্নেলি ইয়াত্তেনম্যাকির নেতৃত্বাধীনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও সুইডিশ পিপলস্ পার্টির সাথে এক কোয়ালিশন সরকার গঠন করে।

জুন মাসের প্রথম দিকে দেশের এক টেবলয়েড পত্রিকা, ইলতা লেহতি প্রথম পাতায় এক খবর দিয়ে ফিনিশ রাজনৈতিক আকাশে ঝড় তোলে। পত্রিকাটি জানায় প্রধানমন্ত্রী আননেলি ইয়াত্তেনম্যাকি নির্বাচনের পূর্বে 'রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য পেয়েছেন এবং তা কাজে লাগিয়েছেন'। গোপন তথ্যটি হচ্ছে 'ইরাক যুদ্ধ' সংক্রান্ত। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পাভো লিপ্পোনেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে একান্ত আলোচনার সময়ে নাকি ইরাক যুদ্ধে ফিনল্যান্ডের নীতিগত সমর্থন ব্যক্ত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বেসরকারী জরিপ অনুযায়ী অধিকাংশ ফিনিশ 'ইরাক যুদ্ধে'র বিপক্ষে ছিল। যাহোক, তৎকালীন ফিনিশ প্রধানমন্ত্রী ও আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আলোচনার বিষয় যেহেতু 'রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য' হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, সুতরাং সেটা সংগ্রহ ও ব্যবহার অপরাধযোগ্য।

ইলতা লেহতি পত্রিকায় খবর বের হওয়ার পর সাংবাদিকদের কাছে প্রধানমন্ত্রী আননেলি ইয়াত্তেনম্যাকি এ ব্যাপারে কিছু বলতে অস্বীকার করেন এবং তিনি কিছু জানতেন না বলে বিবৃতি দেন। পরবর্তীতে টেবলয়েড পত্রিকা আরও প্রকাশ করে যে, সেন্ট্রাল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এ সভাপতি আননেলি, স্যোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'র তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর 'ইরাক যুদ্ধ' সংক্রান্ত মতের কথা অন্যান্যদের জানান। যদিও তিনি তথ্যের উৎসের কথা

বলেননি।

এ নিয়ে বাপক আলোচনা, সমালোচনা চলতে থাকে। প্রেসিডেন্ট তারিয়া হালোনেন তখন গোয়েন্দা পুলিশকে দায়িত্ব দেন 'রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য' কে বা কারা যোগান দিয়েছে, তা বের করার জন্য। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গোয়েন্দা পুলিশ বের করে যে, প্রেসিডেন্টেরই এক পরামর্শদাতা গোপনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর 'ইরাক সংক্রান্ত মত' বিরোধী দলের নেত্রী আননেলি ইয়াত্তেনম্যাকিকে ফ্যাক্সের মাধ্যমে পাঠিয়েছিল। এর মাঝে সেন্ট্রাল পার্টি তার নিজস্ব অনুসন্ধানের মাধ্যমে বের করে যে, তাদের দলেরই একজন পার্টির মিটিং এর খবর গোপনে পত্রিকায় জানায়। সমস্যা দিন কে দিন জটিল হতে থাকে।

প্রধানমন্ত্রী আননেলি ইয়াত্তেনম্যাকি ১৭ জুন পার্লামেন্টে ফ্যাক্সের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের কথা স্বীকার করেন। তিনি জানান যে, ফ্যাক্স পাওয়াটা তার কাছেও অবাক লেগেছিল এবং এ থেকে তিনি কোন সুবিধাই নেননি। সেদিনই কোয়ালিশন দলগুলোর মিটিং-এ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অব্যাহত সমর্থন দিতে অপরাগতা প্রকাশ করে। প্রধানমন্ত্রী আননেলি ইয়াত্তেনম্যাকি তার পরদিন অর্থাৎ ১৮ জুন প্রেসিডেন্টের কাছে তার পদত্যাগপত্র হস্তান্তর করেন।

এখানে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, একটি গণতান্ত্রিক দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, জানার স্বাধীনতা ও বলার স্বাধীনতা পুরোপুরি থাকলেও 'রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা'র সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। 'রাষ্ট্রীয় গোপনীয়' নথিপত্র কাউকে দেয়া বা ব্যবহার করা গুরুতর অপরাধ। এটা অত্যন্ত সহজ ও সরল। এ ক্ষেত্রে আননেলি ইয়াত্তেনম্যাকি যিনি প্রধান বিরোধী দলের নেতা ছিলেন রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য জানার পর, যদিও সেটা তার রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য অনুকূল তথ্য, তথাপি তিনি তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। তাই তিনি অপরাধ করেছেন। তদুপরি তিনি প্রথমেই স্বীকার করেননি বা বলেননি কে তাকে এ সকল তথ্য প্রদান করেছে। এটা অপরাধ। এখানে উল্লেখ্য যে, তথ্য সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে ফিনিশ গোয়েন্দা অনুসন্ধান শুরু করেছে এবং দুর্নীতির অভিযোগ খাড়া করতে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ঘটনাটি বেশ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশও একটি দেশ। এ দেশের কিছু কিছু বিষয় আছে যা গোপনীয়। আইনগতভাবেই গোপনীয়। কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা দল কোন 'রাষ্ট্রীয় গোপনীয়' তথ্য বিতরণ বা ব্যবহার করতে পারে না। এটা নিশ্চয়ই দণ্ডনীয় অপরাধ? দেশের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় এ ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মনে হচ্ছে 'রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা' বলে কিছু নেই। যে কেউ যে কোন তথ্য পাচার করতে পারে। যে কোন তথ্য ব্যবহার করতে পারে। এমনকি যে কোন 'গোপনীয় তথ্য বা নথি' আদালতের মাধ্যমে চাইতেও পারে! আসলেই কি তাই?

বিশ্বের অন্যতম দু'টি গণতান্ত্রিক দেশের সাম্প্রতিক দু'টি ঘটনার কিছুটা আলোকপাত করলে বিষয়টা খোলামেলা হবে। প্রথম ঘটনার প্রেক্ষাপট পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফিনল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পাভো লিপ্পোনেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ইরাক যুদ্ধ সংক্রান্ত যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তার ব্যাপারে জনগণের কোন ম্যান্ডেট নেননি। এটাও সঠিক যে, বেসরকারী জরীপ অনুযায়ী ফিনল্যান্ডের অধিকাংশ জনগণ যুদ্ধের বিপক্ষে ছিল। তথাপি, সে আলোচনার বিষয় ছিল 'রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার' অংশ। তাই সেই রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য কেউ সরবরাহ ও ব্যবহার করতে পারে না। এটা অপরাধ। সে কারণেই কেউ প্রশ্ন করছে না, অন্ততঃ এখনো সে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়নি, কেন পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী জনগণের যুদ্ধ বিরোধী মতামত সত্ত্বেও সে রকম আশ্বাস কেন দিয়েছিলেন? বরং বড় হয়ে দেখা দিয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী আননেলি 'রাষ্ট্রীয় গোপনীয়' বিষয় কেন ব্যবহার করেছেন? রাষ্ট্রীয় গোপনীয় বিষয় জেনেও তথ্য সরবরাহকারীর কথা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে কেন জানাননি? কেন তিনি সেটা স্বীকার করেননি? সে কারণে প্রধানমন্ত্রী আননেলি ইয়াত্তেনম্যাকিকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পদ তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

অপর ঘটনাটিও ইরাক যুদ্ধ সংক্রান্ত। বৃটেনে এখন জোর আলোচনা চলছে ইরাক যুদ্ধের প্রাক্কালে 'যুদ্ধ প্রপাগান্ডা' নিয়ে। বর্তমান লেবার

সরকারকে দোষী করা হচ্ছে এই বলে যে, তারা বৃটিশ জনগণকে 'ইরাক কেন বৃটিশ ও পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ'

সে সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য না দিয়ে মিথ্যা বলেছে। তাছাড়া সাদ্দাম ও ইরাকের বায়োলজিক্যাল ও কেমিক্যাল অস্ত্র সম্পর্কেও মিথ্যা ও মনগড়া তথ্য সন্নিবেশিত করে ইরাকে যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রপাগান্ডা চালিয়েছে। এ ব্যাপারে মূল আলোচনায় এসেছে বহুল প্রচারিত ইরাক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার ডশিয়ে, Irap's weapons of mass destruction'। এটা বলা হচ্ছে যে, গোয়েন্দা বিভাগের মূল রিপোর্টটি বদলিয়ে ডাউনিং স্ট্রিট তাদের মনগড়া তথ্য দিয়ে ডশিয়েটি বানিয়ে প্রচার করেছিল। ইরাক যুদ্ধের কারণে সে দেশের বেশ ক'জন নামকরা মন্ত্রীর পদত্যাগের ঘটনা আমরা জানি। লেবার মন্ত্রীরা এখন বিবিসিকেও দোষারোপ করে বলছে যে, তারা সঠিক সংবাদ পরিবেশন করছে না। ইরাক ডশিয়ে বিকৃতি করা নিয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করছে। ঘটনা দিনকে দিন আরও জটিল হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টও বিষয়টিকে সহজ না করে বরং জটিলই করেছে। বিরোধী দলগুলো 'গণ-অনুসন্ধান কমিটি' গঠন করে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য দাবী জানাচ্ছে।

এখানে যেটা লক্ষ্যণীয় সেটা হচ্ছে, ইরাক সংক্রান্ত গোয়েন্দা বিভাগের তৈরী 'মূল রিপোর্টের' কথা কেউ বলছে না। কেউই সেটা চাইছে না। বিরোধী দল, আইনজীবী, সংবাদপত্র ইত্যাদি গোয়েন্দা বিভাগের মূল রিপোর্টটির কথা জানলেও সেটা প্রকাশ করতে বলছে না। প্রকাশ করার জন্য আদালতে মামলা করছে না। সেটা প্রকাশ করে দিলেই তো সব ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু কেউ বলছে না কেন? এর উত্তর অত্যন্ত সহজ। এটা 'রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য'। এত কিছু হচ্ছে, এত মন্ত্রী পদত্যাগ করছে, প্রতিদিনের সকল সংবাদপত্রের অন্যতম মূল খবর এটা, বিবিসি'র মতো গণ-মাধ্যমকেও যেখানে দোষারোপ করা হচ্ছে তবুও মূল রিপোর্ট তো দূরের কথা– দাবী উঠেছে গোয়েন্দা বিভাগের মূল রিপোর্টের উপর নির্ভর করে গণ-মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য প্রথম যে ডশিয়েটি তৈরী করা হয়েছিল সেটা অন্তত প্রকাশ করা হউক। গোয়েন্দাদের তৈরী 'মূল রিপোর্ট' কেউ চাইছে না! সেটা রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য, তাই।

ঘটনা দু'টি প্রমাণ করে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার গুরুত্ব। গণতান্ত্রিক

দেশেও কিছু কিছু তথ্য আছে যা সর্বসম্মুখে সরবরাহ ও বিতরণ আইনগতভাবে অন্যায় এবং অসম্ভব। কেউ করলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমাদের বাংলাদেশও তো একটা দেশ। কিন্তু আমাদের দেশে কোন কিছু গোপনীয় আছে কি? একটা পরিবারে যতটুকু গোপনীয়তা থাকে অনেকের মতে আমাদের রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ততটুকুও নেই! আজকের বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ব্যবসা বাণিজ্য, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, পারস্পরিক সমঝোতা ইত্যাদি বিষয়ে দেশের পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও স্ট্রাটেজি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোন কিছুই গোপন থাকে না বা গোপন রাখা যায় না, তখন কার্যতঃ উলঙ্গ হয়ে দেশ পরিচালনা করতে হয়। নিছক দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থে দেশকে উলঙ্গ রাখার রাজনীতি কখনো দেশের জন্য মঙ্গলকর হবে কি? উলঙ্গ করার রাজনীতি কি চলতেই থাকবে? এতে করে উলঙ্গ থাকাটাই কি অভ্যাসে পরিণত হবে না? তাতে ক্ষতিটা কার? ক্ষতিটা দেশের, দেশের আপামর জনসাধারণের।

তাই আজ সময় এসেছে দেশের জনগণকে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা। এটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য কাউকে দেয়া এবং ব্যবহার করা যে 'দণ্ডনীয় অপরাধ' সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। অপর দেশের চর হয়ে কাজ করা আর রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য অপরকে সরবরাহ করা যে একই অপরাধ সে তথ্য জনগণকে বুঝিয়ে বলা। রাষ্ট্রের গোপনীয় তথ্য কেউ সরবরাহ করলে বা ব্যবহার করলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রের গোপনীয়তা রক্ষা আর রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার মাঝে খুব একটা ব্যবধান নেই সেটা বুঝার ও বুঝানোর সময় এসেছে। **লেখক ঃ শিক্ষক, গবেষক, কলামিস্ট**

দেশ ধর্ম সংস্কৃতি ও সুস্থতা বিরোধী ছবির অবাধ প্রদর্শনী 'ফায়ার' নিয়ে কিছু কথা ঃ আতিক হেলাল

মধ্যবিত্ত একটি পরিবার। পরিবারটিতে অশীতিপর বিধবা এক শয্যাশায়ী মা তার দুই পুত্রের সাথে একই ছাদের তলায় বাস করেন। বড় পুত্রের বয়স চল্লিশোর্ধ্ব এবং বিবাহিত। তবে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সুখ তাদের নেই এবং সম্ভবত স্বামীর শারীরিক অক্ষমতার কারণে স্ত্রীর অতৃপ্তিটাই মুখ্য। তথাপি সংসারের বড় পুত্রবধূ হিসেবে বার্ধক্যপীড়িত শীর্ণকায় শাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষার মধ্য দিয়ে একরকম সময় কেটে যাচ্ছিল তার। এরই মধ্যে ঐ পরিবারের অপর

ত্রিশোর্ধ্ব পুত্রের নববধূ হয়ে এলে আর একটি যুবতী মেয়ে। তার স্বামী পুরুষটি একটু বহির্মুখী স্বভাবের। ঘরে তার মন থাকে না। বেশীরভাগ সময় কাটে ঘরের বাইরে, বান্ধবীদের সান্নিধ্যে। এরকম একটি শূন্যতাকে উপজীব্য করে বাড়ীর দুই পুত্রবধূ পরস্পর দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং এই ঘনিষ্ঠতা মানসিক পর্যায় থেকে একপর্যায়ে শারীরিক পর্যায়ে উপনীত হয়। শুরু হয় বিকৃত ও অসুস্থ যৌনাচারের এক ভয়াবহ যজ্ঞ।

প্রিয় পাঠক, এটা আমার তৈরী কোন গল্প-কাহিনী নয়। এ কাহিনী ভারতীয় চলচ্চিত্রকার দীপা মেহতার। আর তিনি তার এই অস্বাভাবিক কাহিনী দিয়ে একটি সিনেমা বানিয়ে বাজারে ছেড়ে নিজের দেশেই অবাঞ্ছিত ও আক্রান্ত হয়েছিলেন। 'ফায়ার' নামক তার এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ এবং প্রদর্শনের আগেই তাকে পড়তে হয়েছিল তীব্র ফায়ারিংয়ের মুখে। স্বদেশের মাটিতেই ব্যাপক প্রতিবাদ বিক্ষোভের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে এই সিনেমাটি প্রদর্শন করতে গিয়েও তাকে কম ধকল পোহাতে হয়নি। ছবির সেটও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল কয়েকবার।

কিন্তু বাংলাদেশে? সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে কোন রকম ধকলই পোহায়নি এই বিতর্কিত ফায়ার। ২০০১ সালে পাদুয়া সীমান্তে বিডিআর জওয়ানদের বীরত্বপূর্ণ পাল্টা আক্রমণের 'অন্যরম' ঘটনার পর বর্তমানে জোট সরকারের সময়ে বাংলাদেশে এরকম একটি 'ফায়ার' চালিয়ে দীপা মেহতার মত একজন ভারতীয় কি নির্ঘাত এটাই বুঝে গেলেন না যে, বাংলাদেশের মানুষ সত্যিকার দেশপ্রেমিক ও ধর্মানুরাগী নয়?

রাজধানীর ঢাকার তিনটি প্রেক্ষাগৃহে প্রায় এক মাস ধরে চলল এই সিনেমাটি। কেউ টু শব্দটি করল না এখানে। ঢাকা নিশ্চুপ, মানে বাংলাদেশ নিশ্চুপ। আর সরকারের সেন্সর বোর্ডই তো ব্যবস্থা করেছে এই অনৈতিক ও বিতর্কিত ভারতীয় সিনেমাটি বাংলাদেশের জনসমক্ষে প্রচার করার।

তবে দুই সমকামী নারীর বিকৃত যৌন জীবনযাপনের কাহিনী নিয়ে নির্মিত এই সিনেমাটির অবাধ প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক আবদুল হাই শিকদার বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর একটি চিঠি দিয়েছেন। এই চিঠিতে তিনি বলেন, "খুব আগ্রহ নিয়ে আমি ভারতীয় চলচ্চিত্রকার দীপা মেহতার ছবি 'ফায়ার' দেখতে গত সপ্তাহে মিরপুর, ঢাকার 'সনি' সিনেমা হলে গিয়েছিলাম। ছবিটি দেখে আমি একজন সুস্থ মানুষ হিসাবে স্তম্ভিত হয়েছি। ছবিটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতা পরিপন্থী। দুই সমকামী মহিলার জীবননির্ভর এই ছবি রীতিমত নীল ছবির পর্যায়ভুক্ত। শেষ পর্যন্ত এই ছবিতে সমকামিতার পক্ষেই রায় ঘোষণা করা হয়েছে। ছবিটির নির্মাণ শৈলী যেমনই হোক, কথা হল– যখন পৃথিবীব্যাপী সমকামিতার বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার, যখন বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা খরচ হচ্ছে এইডস প্রতিরোধে, তখন বাংলাদেশের মত ধর্মপ্রাণ মানুষের দেশে এই ভারতীয় ছবি প্রকাশ্যে প্রদর্শনীর ছাড়পত্র দিয়ে আমাদের সেন্সর বোর্ড কি সভ্যতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে চাচ্ছে? কিভাবে এরকম ভয়াবহ ছবি সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দিল সেটাও আমার একটি জিজ্ঞাসা।

উল্লেখ্য, এই ছবির বিরুদ্ধে ভারতেও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। আমি অবিলম্বে এই ছবি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী করছি। যারা এই ছবির ছাড়পত্র দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও অবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠন করে বিচারের দাবী করছি।"

'ফায়ার'-এর কাহিনীতে যা দেখা যায়, তার সার সংক্ষেপ হল ঃ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের নিঃসন্তান বড় পুত্রবধূ ও নববিবাহিত ছোট পুত্রবধূ তাদের স্বামীদের অবহেলা ও অক্ষমতার কারণে নিজেদের মাঝে একটি বিকৃত যৌন-সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা মাজারে গিয়ে সুতা বেঁধে একে অপরের সঙ্গী হিসেবে থাকার অঙ্গীকার করে। এক সময় তাদের এই সম্পর্কের কথা স্বামীরা জেনে যায় এবং তাদের সংশোধনের জন্য বলে। কিন্তু পুত্রবধূদ্বয় সমকামিতাকেই বেছে নিয়ে সংসার ছেড়ে দেয়। এছাড়াও এ ছবিতে বাড়ীর বয়সী অবিবাহিত পুরুষ চাকরকে তার যৌনক্ষুধা মেটাতে অসুস্থ বৃদ্ধার ঘরে নীল ছবি চালিয়ে স্বমেহনে লিপ্ত হবার দৃশ্য দেখা গেছে কয়েকবার। খোদ ভারতেই এ ছবির নির্মাণকালে বিতর্কের ঝড় ওঠে। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ ছবির সেট আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। এমনকি ভারতীয় সেন্সর বোর্ডও এ ছবির সেন্সর সনদ দিতে রাজি না হলে হাইকোর্টের নির্দেশে ছবিটি মুক্তি পায়। তবে হিন্দুদের রোষ থেকে রক্ষা পেতে সমকামী দুই নারীকে মন্দিরে না নিয়ে মাজারে গিয়ে শপথ করানো হয়।

বিষয়টি নিয়ে ঢাকার সংবাদপত্রগুলোও যখন নিশ্চুপ, তখন একমাত্র দৈনিক ইনকিলাবে একটি রিপোর্ট ছাপা হয় গত

শুক্রবার, ৪ জুলাই। "বলিউডের সমকামিতাভিত্তিক বিতর্কিত 'ফায়ার' ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে রাজধানীর প্রেক্ষাগৃহগুলোতে" শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয় ঃ শিক্ষা ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে বিদেশী ছবি প্রদর্শন নিষিদ্ধ না হলেও সাধারণত এদেশের প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় ছবি দেখানো হয় না। চলচ্চিত্র মূলত বিনোদনের

উদ্দেশ্যে নির্মিত ও প্রদর্শিত হলেও এর মাধ্যমে একটি মেসেজ ও বক্তব্য জনগণকে দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু যে ছবির মূল সুর সমকামিতা এবং যে ছবি সমকামিতার পক্ষে রায় দেয়, সেই ছবি প্রদর্শন করে তথ্য মন্ত্রণালয় জাতিকে কী মেসেজ দিতে চায়- সে প্রশ্ন তুলছে দর্শকগণ। সেন্সর বোর্ড নাকি ছবির বেশকিছু অশ্লীল দৃশ্য কর্তন করেছে। কিন্তু যে ছবির কাহিনী শুধু অশ্লীলই নয় বরং বিকৃত যৌনাচারকে উৎসাহিত করেছে, তাকে কী করে সেন্সর বোর্ড মুক্তি দিল সে প্রশ্নও তুলতে দেখা গেছে দর্শকদের। বিশেষ করে বাংলাদেশে যখন অশ্লীলতাবিরোধী প্রবল আন্দোলন চলছে তখন সেন্সর বোর্ড থেকে এ ছবির মুক্তি পাওয়ায় বাংলাদেশে অশ্লীলতা প্রসারের একটি উৎসমুখ জাতির সামনে উন্মোচিত হয়েছে। ফায়ার ছবির মুক্তি প্রসঙ্গে সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান আবু তাহেরের কাছে জানতে চাইলে

তিনি ছবিটি বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে ঐকমত্য পোষণ করে বলেন, এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। কারণ, এটি আমার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বের ঘটনা। তবে একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে, সেন্সর বোর্ডের একাধিক সদস্য এই ছবি বাংলাদেশে প্রদর্শনের ব্যাপারে তীব্র আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু রহস্যজনক কারণে ছবিটি মুক্তি পায়।

এদিকে স্বাস্থ্য ও তথ্য মন্ত্রণালয় প্রতিদিন বিভিন্ন গণমাধ্যমে লাখ লাখ টাকা খরচ করে প্রচার করছে এইডস রোগের অন্যতম কারণ সমকামিতা। কাজেই এইডস থেকে মুক্ত থাকতে সমকামিতা পরিহার করুন। অথচ তথ্য মন্ত্রণালয়েরই একটি শাখা সমকামিতাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরা ছবি 'ফায়ার' বাংলাদেশে প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছে।

এ ধরনের অতি উৎসাহী কর্মকাণ্ড বর্তমান সরকারকে স্যাবোটাজ করার জন্য ঘটানো হয় কি-না এবং সেই সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন মহলও জেগে ঘুমিয়ে থাকে কি-না– এই সবিস্ময় প্রশ্ন দেশের সচেতন নাগরিকদের।

ফায়ার-এর দুই সমকামী নারীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাবানা আজমী ও নন্দিতা দাশ। ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনা এবং সেই সাথে উগ্রবাদী হিন্দুদের তান্ডবলীয় সেদেশের মুসলমান চলচ্চিত্র অভিনেত্রী শাবানা আজমীও যখন আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'এতোদিন ধরে ভারতীয় থাকার পর আজ বুঝলাম, আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় হলে, আমি মুসলমান।' সেই শাবানা আজমী তার মুসলমান পরিচয়টা উপলব্ধি করলেও মুসলমানদের ধর্ম ইসলামের অনুশাসন ও বিধি-নিষেধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন তার কাছ থেকে না পাওয়া গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কিন্তু নব্বই শতাংশ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে কী করে এ ধরনের অবমাননা মেনে নেয়া সম্ভব? ইসলাম ধর্মে যেখানে সমকামিতার মতো বিকৃত যৌনাচারকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, জঘন্য ও অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে, সেখানে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী আদর্শের অনুসারী বর্তমান জোট সরকারের কি কোন নীতি আদর্শ থাকবে না এ ব্যাপারে? আর সমকামী দুই নারী মাজারে গিয়ে অনৈতিকতার শপথ নেবে কেন? মাজার কি সমকামিতাকে সমর্থন করে? যদি তা না করে, তাহলে মুসলমানদের ধর্মবোধ ও নৈতিক জীবনকেও অপমান করা হয়েছে এ ছবিতে। এ ধরনের ছবি সরকারের ভাবমূর্তিকেই মলিন করে দেবে, যা বাংলাদেশের শত্রুরা সব সময় চেয়ে এসেছে। জোট সরকারের নীতি নির্ধারকগণ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন বলে আশা রাখি।

ডাকটিকিটের পেছনে আঠার ব্যবহার যখন থেকে

ডাকটিকিটের গায়ে আঠা লাগানোর রীতি এক সময় ছিল না। লন্ডনে সর্বপ্রথম ডাকটিকিটের পেছনে আঠা লাগানোর প্রচলন ঘটে। ১৮৮০ সালের ৬ মে এই আঠাযুক্ত ডাকটিকিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এই ডাকটিকিটের একদিকে রানী ভিক্টোরিয়ার মুখ ও অপরদিক ছিল আঠাযুক্ত। আঠাযুক্ত এই ডাকটিকিটের প্রথম মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৮২ লাখ ৫৮ হাজার ৮০টি। উক্ত ডাকটিকিটের ২৪৪টির একটি পাতা এখনও লন্ডনের স্ট্যাম্প মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। ❑ **আমিনুল ইসলাম মামুন**

দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান

দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান

মূল ঃ লেঃ জেঃ (অবঃ) এ, এ, কে নিয়াজী

সাবেক কমান্ডার, ইস্টার্ন কমান্ড

ভাষান্তর ঃ সাহাদত হোসেন খান

সমুদ্র প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ জুন, ২০০৩

এ বইটি কোন কল্প-কাহিনী নয়, এটি হচ্ছে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত যুদ্ধ বিষয়ক একটি বই। লেখক নিয়াজী হচ্ছেন এ যুদ্ধের কমান্ডার। তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের পাকিস্তান ইস্টার্ন গ্যারিসনের কমান্ডার হিসেবে মাত্র ৮ মাস দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জানতেন তার দায়িত্বটা কত কঠিন। তবু একজন অনুগত সৈনিক হিসেবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তার নিযুক্তি মেনে নেন। তাকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলায় রাজনৈতিক উদ্যোগ নেয়া হবে এবং সামরিক অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে। কিন্তু তার দায়িত্বে পুরো সময়ে তিনি সংকট নিষ্পত্তির কোন লক্ষণ দেখতে পাননি। শুধু তাই নয়, তাকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মত অস্ত্রশস্ত্র ও জনবলও সরবরাহ করা হয়নি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর বার বার তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। একজন সৈনিকের জন্য আত্মসমর্পণ করার চেয়ে গ্লানি আর কিছু হতে পারে না। এ বইটিতে তার এ যন্ত্রণারই প্রকাশ ঘটেছে। তিনি বলিষ্ঠ যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে একথা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন যে, তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগ করেছে। তিনি এ বইয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন যা সচেতন ব্যক্তিদের জন্য চিন্তার খোরাক হতে পারে।

উমর ফারুক আল-হাদী

দেশের স্বার্থে ওআইসি 'র মহাসচিব পদ নিয়ে সকল বিতর্কের অবসান হোক ঃ অধ্যাপক রেজাউল করিম মামুন

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার OIC পরবর্তী মহাসচিব পদে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ শুরু হতেই এই মনোনয়নের বিরোধিতা করে আসছে। এটা অনস্বীকার্য যে, আওয়ামী লীগ দেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল। এই দলে যেমন রয়েছেন অসংখ্য ত্যাগী নেতৃত্ব ও মাঠ পর্যায়ের কর্মী, তেমনি এর পাশাপাশি রয়েছেন সন্ত্রাসী লুটেরাদের অনেক 'গডফাদার'। এই 'গডফাদারদের' হঠকারী কর্মতৎপরতা দূর করে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারলে এই দলটি আজও ব্যাপক গণসমর্থন নিয়ে দেশে এক নীরব বিপ্লব ঘটাতে পারে। তবে, এজন্য স্বাধীনতার ৩২ বছর পর বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তির উস্কানিতে জাতিকে বিভক্ত করার ঐ সর্বনাশা রাজনীতি তাঁদেরকে

পরিহার করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার গণমুখী রাজনীতি অনুশীলন করতে হবে। নচেৎ এই দলটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন দেখা দিলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ হতে এপার বাংলার পৃথক জাতিসত্তা এবং আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চিত গ্যারান্টি হচ্ছে– মুসলিম জাতিসত্তার স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।

মূলতঃ ওআইসি হচ্ছে এমনই একটি সংস্থা যা মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামিক মূল্যবোধের বিকাশের আন্তর্জাতিক ফোরাম। এখানে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের কোন স্থান নেই। অতএব, ধর্মনিরপেক্ষ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের যে শ্লোগান নিয়ে আওয়ামী লীগ ওআইসি'র মহাসচিব পদে জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মনোনয়নের বিরোধিতা করছে এটা ওআইসি'র মৌল ধারণার পরিপন্থী তো বটেই, অধিকন্তু এটা আওয়ামী নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের জন্যেও আত্মঘাতী ও রাষ্ট্রঘাতী পদক্ষেপ হচ্ছে কি না তা বিবেচনা করার সময় এসেছে।

বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে আরব, আফ্রিকা ও এশীয় অঞ্চলের ৫৭টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত ওআইসি'র মহাসচিব পদে বাংলাদেশের এবার একটি বিশেষ সুযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে। প্রভাবশালী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে একটা গ্রীন সিগন্যাল পেয়েই বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন। পাকিস্তানের সাবেক স্পীকার, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সন্তান খ্যাতিমান পার্লামেন্টারিয়ান জনাব আলহাজ্জ্ব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে ওআইসি'র এই মহাসচিব পদে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের এই মনোনয়নকে সৌদী আরব পাকিস্তান ও কাতার ইতোমধ্যেই সমর্থন দিয়েছে। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া, সেনেগাল, ওমান, আরব আমিরাত ও ইয়েমেনসহ গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশসমূহ এই মনোনয়নকে অনানুষ্ঠানিক সম্মতি প্রদান করেছে।

অন্যদিকে যদিও এই পদে তুরস্ক থেকে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের আরেকটি ঘোষণার কথা শোনা যাচ্ছে, তবুও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নানা কারণে তুরস্কের এই পদে জয়লাভের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। ওআইসি'র মহাসচিব পদে বাংলাদেশের সম্ভাবনা এখন অনেকটাই উজ্জ্বল। তদুপরি, একদিকে পারিবারিক ঐতিহ্য এবং অপরদিকে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী মুসলিম বিশ্ব এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্য বলয়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

এমতাবস্থায়, আওয়ামী লীগ নেতাদের উচিত নেতিবাচক রাজনীতি পরিহার করে দেশের স্বার্থে কাজ করা। এর মাধ্যমেই কেবল তারা জনগণের আস্থা ফিরে পেয়ে ক্ষমতায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। অন্যথায় বর্তমান নেতিবাচক রাজনীতি আওয়ামী লীগকে তাদেরই এককালীন পিতৃসংগঠন মুসলিম লীগের ন্যায় ক্রমান্বয়ে একটি Dead Party তে পরিণত করতে পারে।

আমাদের রাজনীতিকদের উচিত উগ্র মানসিকতাকে পরিহার করে দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও প্রসারিত করা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগের এককালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি (১৯৬৯-৭১) মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরী উভয়েই মুসলিম লীগ নেতা হিসাবে একদিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের সংগ্রাম করেছিলেন। রাজধানী ঢাকাতে ধানমন্ডির একই এলাকায় বসবাসরত বঙ্গবন্ধু পরিবার এবং মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীর পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিয়ে মুখরোচক অনেক জনশ্রুতি রয়েছে। একারণে বিএনপিতে জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর গ্রহণযোগ্যতাও এক সময় প্রশ্নের সম্মুখীন ছিল। কিন্তু ওআইসি'র মহাসচিব পদে জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মনোনয়নকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যেই যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছে, এর ফলে জনাব চৌধুরীর আওয়ামী কানেকশন সম্পর্কে সকল সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটেছে।

দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এখন যদি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে কূটনৈতিক তৎপরতাকে জোরদার করেন তবে আশা করা যায়, এ ব্যাপারে সাফল্য অনেকটা সুনিশ্চিত। গত ২৬ জুন তারিখে জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী কর্তৃক এ ব্যাপারে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করে জাতীয় সংসদে যে ভাষণ দান করা হয়েছে, সেখানে তিনি অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করেছেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের আবেগমুক্ত মনে চিন্তা করে জনাব চৌধুরীর এই অপ্রিয় সত্য কথাগুলো বিবেচনায় নেয়া উচিত। এতে তাঁরা মোটেও ছোট হবেন না কিংবা তাঁদের মর্যাদা কমে যাবে না। বরং এই উদারতার জন্য দেশবাসী তাঁদেরকে ঠিক সেভাবেই বিবেচনা করবেন যেভাবে প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বকে ভারতবাসীরা একবার প্রত্যাখ্যান করার পরেও পুনর্বিবেচনা করেছিল।

গত ৪ জুলাই তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল,

মুক্তিযুদ্ধের এক লড়াকু সিপাহসালার এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে জাসদের ২নং তাত্ত্বিক নেতা অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ "সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বক্তব্য ঃ আওয়ামী লীগারদের কি কোন জবাব আছে?"–শিরোনামে যে কলামটি লিখেছেন উহাও বিবেচনা করে দেখার জন্য আমি আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করছি। জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী গত ৩ জুলাই তারিখে চট্টগ্রামের এক সুধী সমাবেশে যথার্থই বলেছেন যে,–"মুসলিম উম্মাহ আজ কঠিন সময় অতিবাহিত করছে। মুসলমানদের ধন-সম্পদের কোন অভাব নেই, আমাদের দুর্বলতা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার ক্ষেত্রে। নতুন শতাব্দীর এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে অর্থনৈতিক, সামাজিক, কূটনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রচার মাধ্যমসহ সকল পর্যায়ে বাংলাদেশসহ গোটা মুসলিম উম্মাহকে সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আসল জিহাদে জয়ী হতে হবে।"

জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর এই উপলব্ধিই প্রমাণ করে তিনি তথাকথিত ঐ রাজাকার বা তালেবানী চিন্তাধারা নিয়ে নয়। বরং মুসলিম আধুনিকতার এক যুগোপযোগী দিশারী হিসাবে ওআইসি'র নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সময়ের এক সাহসী সিপাহসালার। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের উচিত মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে যেভাবেই তাঁকে মূল্যায়ন করা এবং নিছক বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা না করে সকল কাদা ছুঁড়াছুঁড়ির অবসান ঘটিয়ে তাকে বন্ধু হিসাবে আলিঙ্গন করা।

এদিকে সর্বশেষ তথ্যে জানা যায়, মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদের প্রধানমন্ত্রীত্বের মেয়াদ শেষ হবে আগামী নভেম্বরে। এমতাবস্থায়, মালয় সরকার যদি তাঁকে এই পদে মনোনয়ন দেয় তবে বাংলাদেশ এই প্রার্থিতা প্রত্যাহারও করে নিতে পারে। তাহলে এই যাত্রায় না হলেও এই পদে নিযুক্তি লাভের ক্ষেত্রে বয়সের বিবেচনায় জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর জন্যে ভবিষ্যতে আরও অনেক সুযোগ রয়েছে।

পরিশেষে, জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী আমাদের জাতীয় সংসদে দীর্ঘ ২৪ বছরের রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ভাংগা-গড়ার ইতিহাসের এক অপরাজিত জাতীয় সংসদ সদস্য। বঙ্গবন্ধু এবং শহীদ জিয়া যেমন সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি, বঙ্গশার্দুল সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীও তেমনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। তবে এই ধরনের জাতীয় নেতৃত্বের চরিত্র হননের যে কোন অপচেষ্টা নিন্দনীয়। তাই আমরা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সব মহলেরই সংযত আচরণ কামনা করি।

লেখক ঃ প্রফেসর ইসলামের ইতিহাস বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।